বায়ু দূষণের কবলে ঢাকা: স্বাস্থ্যঝুঁকি ও আমাদের করণীয়

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ

ঢাকা মহানগর মারাত্মক বায়ুদূষণের শিকার। ঢাকার বাতাসের মান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রার চেয়ে বেশ নিচে। বিশেষ করে, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ঢাকার বায়ুমান বেশ অস্বাস্থ্যকর থাকে। এই সংকট মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে বাসিন্দাদের শ্বাসযন্ত্রের রোগ আক্রান্তের হার আগামীতে অনেক বেড়ে যাবে। অনেকেরই ধারণা নেই, বায়ুদূষণ কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বায়ুদূষণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এতে জনসাধারণ নিজেদের রক্ষা করতে পারবে এবং দূষণ কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত হবে।

বাতাসে ক্ষতিকর উপাদান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকলে বায়ুদূষণ হয়। ঢাকায় বায়ুদূষণের কারণগুলোর মধ্যে গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার নির্গমন, নির্মাণকাজের ধুলাবালি, ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া এবং আবর্জনা পোড়ানোর ধোঁয়া- এগুলো প্রধান। ইটের ভাটাগুলো শহরের বাইরে থাকলেও ঢাকার বায়ুদূষণে এদের অবদান অনেক। বায়ুদূষণ খালি চোখে দেখা যায় না বলেই অনেকে এটিকে ততটা গুরুত্ব দেন না। কিন্তু এর ক্ষতি সুদূরপ্রসারী। ঢাকার বাতাসের পার্টিকুলেট ম্যাটার ২.৫ (বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র কণা যাদের ব্যাস ২.৫০ মাইক্রোমিটার) এর পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মানের বহুগুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ঢাকার বায়ুর মান সূচক প্রায়শই 'ঝুঁকিপূর্ণ' বা 'বিপজ্জনক' পর্যায়ে পৌঁছে। স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য এটি বড় হুমকি।

সেন্টার ফর অ্যাটমসফেরিক পলিউশন স্টাডিজের ২০২১ সালের এক সমীক্ষায় ঢাকার আশেপাশের প্রায় ১,২০০টি ইটভাটা এবং কয়েক হাজার হাজার কারখানাকে বায়ুদূষণের জন্য দায়ী করা হয়। রাজউকের তথ্যমতে, ঢাকায় প্রতিবছর প্রায় ৫০০টি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। তবে এগুলোর নির্মাণ কালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধুলা নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা থাকে না। রাস্তা ও ভবন নির্মাণ বা মেরামতের সময় ধুলাবালি যেন বাতাসে ছড়িয়ে না পড়ে, এজন্য নির্মাণ স্থানে অস্থায়ী ছাউনি বা বেষ্টনী দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্মাণ সামগ্রী যেমন- মাটি, বালি, রড ও সিমেন্ট ঠিকভাবে ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে অন্তত দুইবার পানি ছিটাতে হবে। অন্যদিকে, ঢাকায় চলাচলকারী বাসগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এ ধরণের বাস হতে কার্বন ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস মিশ্রিত ধোয়ার পরিমাণ বেশি থাকে।

সেন্টার ফর রিসার্চ অন অ্যানার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের গবেষণায় জানা যায় বায়ুদূষণের কারণে দেশে প্রতিবছর ৫ হাজার ২৫৮ শিশুসহ ১ লাখ ২ হাজার ৪৫৬ জন মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বায়ুদূষণের প্রভাব তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি- উভয় ধরনের হতে পারে। দুটোই অত্যন্ত ক্ষতিকর। দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার ফলে চোখ জ্বালাপোড়া, কাশি, মাথাব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে, শিশুদের হাঁপানি ও শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এমনকি এটি অকাল জন্ম এবং শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং পূর্ব থেকেই অসুস্থ ব্যক্তিরা দীর্ঘমেয়াদী বায়ুদূষণের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। তাই বায়ুদূষণ রোধে সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

দুঃখজনক হলো- তীব্র স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, ঢাকার অধিকাংশ বাসিন্দা এখনো এই সমস্যা নিয়ে খুব একটা সচেতন নন। তাই নাগরিকদের মাঝে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার চর্চা তেমন একটা দেখা যায় না। অনেকেই না জেনেই বর্জ্য পোড়ানো, অতিরিক্ত ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার কিংবা পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অমান্য করে বাতাস দূষিত করছেন। সমস্যাটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাবে মানুষের মধ্যে তেমন কোনো তাগিদ তৈরি হয়নি।

সরকার বায়ুদূষণ মোকাবিলায় কাজ করছে। অনুপযুক্ত যানবাহন নিষিদ্ধ করা, ইটের ভাটায় ধোঁয়া এবং শিল্প কারখানার নির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে ও সেগুলোর বাস্তবায়ন করছে। ইটভাটার দূষণ কমাতে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনে পরিবেশবান্ধব ইট তৈরিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিত বায়ুমান পর্যবেক্ষণ করছে। ঢাকাসহ সারাদেশে মোট ৩১টি কন্টিনিউয়াস এয়ার মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বায়ুমান পরীক্ষা করা হয়। নির্মাণকাজের ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দিয়েছে। এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ঢাকা সিটি করপোরেশনগুলো রাস্তাঘাট পরিষ্কার, পানি ছিটানো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করছে। এগুলোর পরিসর বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। নির্মাণকালে ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণে কঠোর হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অনিয়মকারী ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করা দরকার। এছাড়া পুরাতন ও অনুপযুক্ত বাসের চলাচল নিয়ন্ত্রণে সার্বক্ষণিক মনিটরিং প্রয়োজন।

বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা করতে সচেতন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। প্রতিদিনের বায়ুমান সূচক পর্যবেক্ষণ করা এবং দূষণের মাত্রা বেশি থাকলে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। সম্ভব হলে ঘরে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে। অফিস কিংবা ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ঘরে গাছ রাখলে তা বায়ুমান উন্নত করতে সাহায্য করবে। আশপাশের আবর্জনা পোড়ানোর অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার সীমিত করা দরকার। সুযোগ পেলে সাইকেল বা গণপরিবহণ ব্যবহার করে আমরা বায়ুর মান উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারি।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও বিপণন নীতি চর্চা চলা। শিল্পকারখানাগুলোর পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলা জরুরি। এছাড়া, এ সকল প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) আওতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। পরিবেশবান্ধব কারখানাগুলোর অর্জন ও সাফল্য টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করতে হবে।

১৯৭০-৮০ দশকে মেক্সিকো সিটি বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলোর একটি ছিল। শহরটির বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ও ওজোনের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে বেশি ছিল। বাতাসের মান উন্নয়নে দেশটির সরকার বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাথে সাথে মেক্সিকো সিটিতে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে নাগরিকদের যানবাহনের ধোঁয়া ও গণপরিবহণের সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকার ও গণমাধ্যম বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম জোরদার করে। বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা টিভি, পত্রিকা এবং জনসমাবেশে মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে আসেন। সমন্বিত এ সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯০ দশকে শহরটির বাতাসের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করে।

ঢাকার বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য ঢাকা গড়তে নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সবচেয়ে বড় শক্তি। বায়ুদূষণ প্রতিরোধে আরও বেশি গাছ লাগানো, স্থানীয়দের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেওয়াসহ দূষণপ্রতিরোধী উদ্যোগের প্রতি আরও জনসমর্থন দরকার। ঢাকার বায়ুদূষণ পরিস্থিতির উন্নয়নে গণপরিবহণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রয়োজন। ব্যাক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমাতে গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি অপরিহার্য। স্কুল, অফিস ও স্থানীয় কমিউনিটিগুলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। বায়ু দূষণের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে টেলিভিশন, রেডিও ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো যেতে পারে। গণমাধ্যমকর্মী, জনপ্রিয় সেলিব্রিটি, ইউটিউবার ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট নির্মাতারা আকর্ষণীয় ভিডিও, ব্লগ ও পোস্টের মাধ্যমে দূষণের ক্ষতিকর দিকগুলো সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। বায়ুদূষণ নিয়ে টেলিভিশন ও রেডিওতে বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে দূষণের কারণ ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানানো যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয় চ্যালেঞ্জ, ট্রেন্ড বা আন্দোলনের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এছাড়া, রিয়েল-টাইম এয়ার কোয়ালিটি আপডেট প্রচার করা এবং সাধারণ মানুষকে দূষণ কমানোর উপায় সম্পর্কে জানানো যেতে পারে।

জনসচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ুদূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মসূচি, ইকো-ক্লাব, পরিবেশ মেলা, সেমিনার ও প্রতিযোগিতার মতো উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বায়ুর মান উন্নয়নের মতো বাস্তব সমস্যা সমাধানে যুক্ত করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা দূষণ নিয়ন্ত্রণের নতুন কোন সমাধান বের করার সুযোগ পাবে। এছাড়া, পরিবার ও কর্মস্থলে বায়ুদূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সবুজ ঢাকা গড়তে সকল ভবনে সবুজ ছাদ তৈরিকে আরও উৎসাহিত করতে হবে।

বায়ুদূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন ডিজিটাল প্লাটফরমকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। মোবাইল অ্যাপ চালু করে দূষণের মাত্রা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। এসএমএসের মাধ্যমে সতর্কীকরণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপায় জানানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া, নাগরিকদের জন্য ডিজিটাল রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম চালু করা যেতে পারে, যেখানে জনসাধারণ দূষণকারী যানবাহন ও কারখানার তথ্য সরকারকে জানাতে পারবে।

ঢাকার বায়ুদূষণ মোকাবিলায় সরকার, স্থানীয় সরকার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান আর সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দূষণ রোধে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশ রক্ষায় আমাদের সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, গাছ লাগানো, গণপরিবহণ ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা, ধুলাবালি তৈরি নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে আমরা ঢাকার বাতাসকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারি। পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও সুস্থ ঢাকা গড়তে নাগরিক সচেতনতা এবং উদ্যোগই হতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

#

লেখক: পরিচালক (মিডিয়া) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

পিআইডি ফিচার